যোগাযোগের গল্প ঃ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিরা

প্রিয়ব্রত ঘোষাল

বিশ শতকের দু-তিনের দশক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর সৃষ্টির পরিণতি পর্বে। সত্তর বছর বয়সেও লিখে চলেছেন, অবিশ্রান্ত। অন্যদিকে, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর বাংলা সাহিত্যজগতে তিনি এমন একটি সর্বজনমান্যতা অর্জন করেছেন যে, এমনকী অদীক্ষিত পাঠকের কাছেও বাংলা সাহিত্যের চূড়ান্ত বক্তব্য তিনি-ই। এর ফলে সমস্যা হল সেইসব লেখকদের, যাঁরা সেই সময় সাহিত্যজগতে সবে পা ফেলেছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনই সেই মুহূর্তে তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তখন 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে প্রগতি, সংহতি, কালিকলম— এইসব পত্রিকাও। আর লেখককুলের মধ্যে রয়েছেন— প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। তৎকালীন আবহাওয়ার তাঁরা প্রয়োজন বোধ করলেন এক সাহিত্যিক বিদ্রোহের, রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে। একে ঠিক রবীন্দ্র বিরোধিতা বলা যায় না, কেননা তাঁরা চাইছিলেন পাঠকেরা তাঁদের লেখার দিকেও চোখ ফেরান, এইটুকুই। তবু তাঁদের কপালে রবীন্দ্র - বিরোধী — এই বিশেষ লেবেলটি মেরে দেওয়া হল। এঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত স্তরে রবীন্দ্রসাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে উন্মুখ। চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে চান কবিগুরুর সঙ্গে। শান্তিনিকেতনের আতিথ্য স্বীকারে প্রবল আগ্রহ দেখান। সমালোচনা করেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনেও বসিয়ে রেখেছেন নিশ্চিতভাবে।

আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা পাঁচজন প্রধান আধুনিক কবিকে বেছে নিয়েছি— জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন এবং বুদ্ধদেব বসু। অমিয় চক্রবর্তীকে সচেতনভাবে বাদ দিয়েছি। কারণ, এই আলোচনায় আধুনিক কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতান্তরের যে চিত্রটি তুলে ধরতে চাইছি, অমিয় চক্রবর্তী সেখানে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন না। এইসব কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের গল্পটা (তাঁদের পারস্পরিক পত্র - বিনিময়ের সূত্রে) বলে নিয়ে, প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়' গ্রন্থটির প্রকাশ এবং সেই উপলক্ষে সাহিত্যিক মহলে যে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, সে সম্পর্কেও দু-চার কথা বলব।

গোড়াতেই বলেছি, আধুনিক কবি - সাহিত্যিকরা চাইছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে পাঠকের চোখকে একটু নিজেদের লেখাপত্রের দিকে ফেরাতে। এই কাজটি করার জন্য তাঁরা বেছে নিলেন নিজস্ব গোষ্ঠীভুক্ত কিংবা স্ব-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির আলোচনার স্তম্ভ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকার 'মাসিকী' কলামে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের একটি সংখ্যায় লিখছেন, —

''সৌভাগ্যবশত, অতি আধুনিকেরা অন্ধ রবীন্দ্রমোহ থেকে মুক্ত। তারা, পথ, বাঁশি প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুকে অবলম্বন করে জনৈকা 'অচেনা'র উদ্দেশ্যে 'অজানা' প্রেম নিবেদন না করলেও যে কবিতা হতে পারে, এ-চৈতন্য তাঁদের হয়েছে। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় এ-প্রশ্নের মীমাংসা এখনো বিচার সাপেক্ষ, তবে রবীন্দ্রনাথ যে বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর তুল্য আরো কবির আবির্ভাব তখনি সম্ভব হবে, যখন বাঙলা কবিতার সুর রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র হবে। অতি আধুনিকদের কাব্যে এই স্বতন্ত্রতা আছে, এবং এটি খুব শুভ লক্ষণ। তাদের নিজেদের একটি বক্তব্য বিষয় আছে এবং সে কথা বলার জন্যে প্রত্যেকে এক - একটি আলাদা ভঙ্গিও খুঁজে পেয়েছেন। কবিতার technique ও মনের attiude-এ এই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাচ্ছে।

মনে হয়, বাঙালীর কাব্যপ্রতিভা প্রধানত lyrical, বৈষ্ণব কাব্য রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রেরণাউৎস। রাধাকৃষ্ণের cult থেকে আমরা এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারিনি, কিন্তু না পারা পর্যন্ত বাঙলা কবিতা জাতে উঠবে না। বাঙালীর চরম কবিত্ব হচ্ছে— 'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।' হৃদয়াবেগের এমন অপরূপ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নেই— যদিচ হৃদয় নিয়েই তাঁর কারবার। তাঁর কবিতায় পাই একটি অলস ভাব - বিলাসিতা— 'হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা আপন মনে'। তাঁর কাব্য - জগত হচ্ছে সংসার সমাজ বিচ্ছিন্ন বায়ু - মর্মরিত কুঞ্জভবন। আগাগোড়া তিনি এই একটি কথা বলে গেছেনঃ

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।''

উল্টোদিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''এখনকার গদ্য বা পদ্য কাব্য আমি বয়ে পড়িনে পাছে আমার রুচির সঙ্গে না মেলে। আমি এই কথা মনে করতে ইচ্ছা করি যে নতুন যুগের মন নতুন রীতিতে লিখতে চাইবে—প্রথম প্রথম হুঁচট খেলেও হয়তো ক্রমে চাল দুরস্ত হয়ে যাবে। সার্থকতা বিচার করবার সময় এখনো আসেনি এবং আমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব।''

এইসব ভাবনাচিন্তার মধ্যেই কিন্তু আধুনিক কবিরা চাইছেন রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি আসতে, তাঁর কাছেই যাচিয়ে নিতে চাইছেন নিজেদের কবিতা। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের সবচেয়ে বিশিষ্ট কবি জীনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে 'আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী' এবং 'মহামানব' বলে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, ''আমার নিজের জীবনের তুচ্ছতা ও আপনার বিরাট প্রদীপ্তি সবসময়েই মাঝখানে কেমন একটা ব্যবধান রেখে গেছে— আমি তা লঙ্ঘন করতে পারিনি।''

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' রবীন্দ্রনাথকে খুশি করতে পারেনি।'' লিখেছেন, 'ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এ জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহাসিত করে।

বড় জাতের রচনার মধ্যে একটি শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জন্মে, জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো।''

আমার পরবর্তী বই, বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সম্পর্কে ব্যয় করলেন মাত্র দুটি বাক্য।

তাঁদের মত - বিনিময়ের অন্য কোনো নিদর্শন আপাতত আমাদের সামনে নেই।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল বিশেষ অন্তরঙ্গ। উভয়ের পত্রবিনিময়েও (রবীন্দ্রনাথের লিখিত ৩৮টি এবং সুধীন্দ্রনাথ লিখিত ১২টি পত্র, যা আমাদের সামনে আছে) তা ধরা পড়ে। পরস্পরের রচনা সম্পর্কে দুজনেই বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী'। ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে'' উৎসর্গ করে ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন, ''পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশি বিদেশি অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন— সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা, খুঁজে, যদি কোনোখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ বলে ধরে নেওয়া প্রায় নিরাপদ।'' আবার রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর 'আকাশপ্রদীপ' নামের কবিতার বইটি। এবং, আধুনিক কবিকুলের মধ্যে সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথই একমাত্র, যাঁর কবিতা সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসঙ্কোচ প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রাথ — ''তুমি অসঙ্কোচে প্রকাশ্যে আমার কাব্যভাষা থেকে ভাষা নিয়ে ব্যবহার করেছ। পাছে কেউ ভাবে আমার সঙ্গে তোমার কাব্যগত সাম্প্রদায়িক যোগ আছে বলেই আমি তোমাকে পুরস্কৃত করছি এই আমার ভয় ছিল। বস্তুত, যা তোমার নিজের কাজে লাগবে তাকে সর্ব্বজনসমক্ষেই গ্রহণ করবার সাহস তোমার ছিল; ... বাংলা সাহিত্যে তুমি যথার্থই আধুনিক কিন্তু তোমার কাব্য আধুনিকত্বের ভেক ধারণ করতে উপেক্ষা করেছে।'' তবে, মজার ব্যাপার এই, এখানে একটু আশঙ্কার ভঙ্গি থাকলেও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ প্রায় স্বীকারই করে নিচ্ছেন, তাঁর কাব্যের অনুপ্রেরণায় সুধীন্দ্র - কাব্যের সৃষ্টিতেই তিনি বিশেষভাবে উল্লসিত— ''সুধীন্দ্র দত্তের কবিতার সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার পরিচয় আছে এবং তার প্রতি আমার পক্ষপাত জন্মে গেছে। তার একটি কারণ, তাঁর কাব্য অনেকখানি রূপ নিয়েছে আমার কাব্য থেকে''। (বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি)

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে একবারই রবীন্দ্রনাথের সামান্য মতপার্থক্য ঘটেছিল, 'বাংলা কাব্যপরিচয়' -এ সুধীন্দ্রের কবিতা সংকলনের ব্যাপারে। বিষয়টি আমরা পরে উল্লেখ করছি।

সুধীন্দ্রের প্রতি যেমন 'পক্ষপাত' অন্য এক আধুনিক কবি বিষ্ণু দে'র কবিতার প্রতি তেমনি এক ধরনের বিরাগ কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের। ''এ বুঝিয়ে দিতে পারলে শিরোপা দেবো''— বিষ্ণু দে'র কবিতা সম্পর্কে এমন মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার করেছেন 'মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'সব পেয়েছির দেশে'তে এর উল্লেখ আছে। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র বিনিময়ের যে নিদর্শন আমাদের সামনে আছে, তা-ও খুব সংক্ষিপ্ত। সেখানে বিষ্ণু দে'র কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছিলেন, ''সাহিত্যে অনেকে নতুনের বড়াই করে কিন্তু চলে পুরাতনের পিছু পিছু। তোমার মধ্যে যথার্থই নতুন পথ খননের অধ্যবসায় দেখা গেল।'' তবে নিজের অস্বস্তিটুকুও গোপন কনেননি, ''প্রথম আরম্ভে জমিটা থাকে এবড়োখেবড়ো... মাঝে মাঝে উঁচোট খেয়েছি কিন্তু বুঝেছি যে জোরে চলবে কোদালখানা।'' পরবর্তীকালে এই অস্বস্তি আরো বেড়েছে। বিষ্ণু দে'র পরের বই (খুবই উল্লেখযোগ্য বাংলা কবিতার ইতিহাসে) 'চোরাবালি', রবীন্দ্রনাথ প্রথমে পড়েই দেখছেন না— ''ছুটি যখন পাব পড়ে দেখব এবং যদি কিছু বলবার থাকে বলব'', পরে কবি আবার অনুরোধ জানাতে কবুল করছেন, ''কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমার নতুন লেখা বইখানি পড়তে চেষ্টা করিনি তা ঠিক নয়। কিন্তু তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছ যে আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে। অভ্যস্ত আদর্শে বিচার করতে পারিনে, অন্য আদর্শ আমার জানা নেই।'' কাব্যের ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত দু-পক্ষের সন্ধি হয়নি বলেই বোধ হয়।

এই সময়ের আর এক উল্লেখযোগ্য কবি সমর সেনের কাছে ''রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাসমস্যার ব্যাপার।''। তাঁর 'বাবু বৃত্তান্ত' -এ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ আলোচনায় একটি বিদ্রুপের ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। ওখানেই তিনি লিখেছেন, ''রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচকেরাও নিজেরা কিছু লিখে তাঁর কাছে দু-এক ছত্র সার্টিফিকেট পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন''। এটা অনেকটা আত্মসমালোচনার মতোও শোনায় যখন সমর সেন নিজেও তাঁর কবিতার বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রার্থনা করেন। 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাঠান্তে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে সমর সেনের কবিতার বিষয়ে বলেন, ''সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা টেঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে''। কিন্তু 'গ্রহণ' কাব্যগ্রন্থটি পাঠিয়ে সমর সেন তাঁর অভিমত জানতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করেছে সে আমার অপরিচিত..আমাদের রসসম্ভোগের অভ্যাস তোমাদের এ যুগের নয় ক্ষুণ্ণ মনে এই কথা কবুল করে তোমাকে আশীর্বাদ জানাই''।

তাঁদের শান্তিনিকেতন ভ্রমণ সম্পর্কে সমর সেনের 'বাবু বৃত্তান্ত' -এ তির্যক মন্তব্য আছে। ওখানকার আতিথেয়তার ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু উচ্ছ্বসিত ('সব পেয়েছির দেশে'), কিন্তু সমর সেন লিখেছেন, ''খেতে যেতাম টিনের চাল দেওয়া একটা হলে। প্রচণ্ড গরমে গলা দিয়ে কিছু নামতো না, এমন একটা জায়গায় খাওয়ার বন্দোবস্তো করে কর্তৃপক্ষ যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তার তারিফ করতাম,'' সামগ্রিকভাবে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে সমর সেনের অভিমত 'ব্রাহ্ম-পল্লীসমাজ'।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের চিত্রটিই সবচেয়ে বর্ণময়। ১৯৩২ -৩৩ সাল নাগাদ তাঁদের পত্রবিনিময় শুরু, কিন্তু তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্রের রীতিমতো আদানপ্রদানের প্রবাহ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকাটি প্রকাশের পর থেকেই। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর অভিমত প্রার্থনা করেন, সঙ্গে রচনাও। রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর সবিস্তার মতামত জানান, যা বুদ্ধদেবকে মুগ্ধ করে। সঙ্গে পাঠান 'আনকোরা নতুন লম্বা মাপের গদ্যকবিতা ছুটি—তাঁর সেই সময়কার একটি শ্রেষ্ঠ রচনা'। বুদ্ধদেব এরপর, 'কবিতা'র প্রায় প্রতিটি সংখ্যার জন্যেই, রবীন্দ্রনাথের কাছে অবিরাম লেখা চাইতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও, ''আমার কলমটাকে পিঁজরাপোলে পাঠাবার সময় এসেছে'' জানিয়ে যথাসম্ভব তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে চলেন। একই সঙ্গে বুদ্ধদেবের নিজস্ব লেখালেখি সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ মতামত দেন। 'বাসর ঘর' তাঁর ভালো লেগেছে, 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ততটা নয়— এমন সব উল্লেখ তাঁর চিঠিপত্রে পাই, (তবে, মন্তব্যগুলি বুদ্ধদেবের গদ্যরচনা সম্পর্কে)। রবীন্দ্রনাথের এই অকৃপণ - দাক্ষিণ্যে সাময়িক ছেদ দেখতে পাই, যখন সেই সময়

প্রকাশিত একটি বই নিয়ে সাহিত্যিক মহলে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সেই প্রসঙ্গে এখন আলোচনা করব।

বইটির নাম 'বাংলা কাব্যপরিচয়'। প্রকাশ জুন ১৯৩৮। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পুরনো - নতুন বাংলা কবিতার একটি সংকলন। আধুনিক কবিরা খুবই কৌতূহলী ছিলেন বইটির ব্যাপারে কেননা, এর আগেই রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এডওয়ার্ড টমসনের উদ্যোগে 'অকসফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স' বেরোবার কথা তাঁরা শুনেছিলেন। নানা গোলযোগে সেটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বদলে তাঁদের হাতে এল এই 'কাব্যপরিচয়'। তাঁরা আশা করলেন, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মানুষটির যোগ্য সম্পাদনায় বাংলা কবিতার একটি নির্ভরযোগ্য পরিচিতি পাঠকের সমনে আসবে, তাঁদের রচনাকেই বা রবীন্দ্রনাথ কীভাবে দেখছেন, আরও একটা পরিচয় মিলবে সেখানে। কিন্তু, প্রকাশিত হবার পর 'গভীরতর নৈরশ্যে' নিমজ্জিত হলেন তাঁরা। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, ''এমন একটি নিশ্চরিত্র সংগ্রহ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক''।

সংকলনটির নানান ত্রুটি - বিচ্যুতি ছিল, কিন্তু সব ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল আধুনিক কবিদের কবিতা নির্বাচনের বিষয়টি। সেখানে জায়গা পেলেন না বিষ্ণু দে বা সমর সেন, কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন অনেক অপরিচিত কবি। জীবনানন্দ প্রকাশিত হলেন একটিমাত্র কবিতায়, কর্তিত আকারে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে কবিতা দুটি সংকলনভুক্ত হল, তার মধ্যে একটি —'নবীন লেখনী', সুধীন্দ্রনাথের মতে তাঁর সব কবিতার মধ্যে 'নিকৃষ্টতম'। সুতরাং 'ওই কবিতাটি সংকলন থেকে বাদ দিলে অনুগৃহীত হবো'—বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে (পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথকেই) পত্রযোগে জানালেন সুধীন্দ্রনাথ। সব মিলিয়ে, বইটি নিয়ে বেশ একটা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল।

এবং, আধুনিক কবিদের এইসব প্রতিক্রিয়ায় বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হলে রবীন্দ্রনাথ। ''কবি সম্প্রদায়ের মেজাজ আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু বোধ হচ্ছে দেবা না জানন্তি। যাই হোক এখন থেকে শত হস্তেন কবিনাম''— সজনীকান্ত দাসকে চিঠিতে লিখছেন তিনি। আরো বলছেন, ''চেম্বারলেনি পদ্ধতিতে কাটাছেঁড়া করে এই হিটলারি সম্প্রদায়ের উষ্মা নিবারণ করতে যদি পার তা হলে আমার পরিত্রাণের উপায় হবে।''

বুদ্ধদেব বসু 'বাংলা কাব্যপরিচয়' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায়। সেই প্রতিকূল সমালোচনামূলক ''সংখ্যাটি বেরোনোমাত্র কাটা গেল আমাদের বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপন''— লিখেছেন বুদ্ধদেব, তবে ''আমার ভাগ্যে অধিকদিন আমাকে রাহুর দৃষ্টি পোয়াতে হয়নি, রবীন্দ্রনাথ অচিরে ক্ষমা করেছিলেন''— এও জানাচ্ছেন।

কথাটি যথেষ্ট পরিমাণে সত্যি, এই দুজনের পরবর্তী পত্রবিনিময় তা প্রমাণ করে। বইটা বেরোনোর সমসময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে অবশ্য অভিমানের সুর তীব্র, ''তোমরা কবিতার নতুন পথ তৈরি করতে লেগে যাও— আমার পথ চলে গেছে কোন বেঠিকানায়। সেদিকটাতে তোমাদের পণ্যেরও ব্যবসায় তোমরা তুলে দিয়েছ। নতুন ব্যবসায়ের হিসাব - নিকাশী এখনো দেখা দেয়নি, মনে মনে লাভের অঙ্গ কষে চলেছে, আশা করি মহাজনী জমে উঠবে— এতকালের সমস্ত খাতাপত্র বাতিল করে দিয়ে। তোমাদের পথটা বিশেষ দুর্গম বলে বোধ হচ্ছে না, যদি সঙ্কোচ না থাকত তোমাদের দলে ভিড়তে পারতুম। মুদ্রাভঙ্গি অভ্যাস করা শক্ত নয়। কিন্তু তার আরোপিত মূল্যকে বিশ্বাস করা শক্ত। বিস্তর কবি পাবে, যারা মুদ্রাভঙ্গি করতে করতে সাহিত্যের পথে শোভাযাত্রা করবে— শোভা হবে কিন আমাদের পক্ষে বলা শক্ত'' (ইটালিকস্ আমাদের)

এই চিঠিতে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের অনাস্থারই প্রকাশ দেখি। এর দু'বছর পরে যখন বুদ্ধদেব বসুরই উদ্যোগে আধুনিক কবিতার একটি নতুন সংকলন প্রকাশিত হল, তখনো, রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কায় দুপক্ষের ভাবনার ব্যবধানটিই বড় হয়ে ওঠে, ''তোমাদের সংকলিত আধুনিক বাংলা কবিতা পাওয়া গেল। ভয় ছিল যা কিছু বিকলাঙ্গ বিকৃত যা কিছু প্রকৃতির আবর্জনা সেইগুলিকে ঝেঁটিয়ে একত্র করে তার উপরে বাঁকা দুর্বোধ্য লেখার ছাপা দিয়ে দুর্ভাগা সাধারণের সামনে উপস্থিত করবে, ভুলিয়ে নিয়ে যাবে তাকে মানবের চিরন্তন রুচি ও রীতির রাজপথ থেকে।'' তবে গ্রন্থটি পাঠের পর রবীন্দ্রনাথের ভয় কেটে গেছে, ''তোমাদের এই সংকলন দেখে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হয়েছি''। অন্যত্রও বুদ্ধদেবের বিচারবোধের প্রশংসাই করছেন— ''কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো ভাষায় ভাবে ও অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে''। অথবা 'কবিতা'র রবীন্দ্র সংখ্যা সম্পর্কে, ''আমাকে অবলম্বন করে এবারকার কবিতা পত্রিকায় সাহিত্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তেমন সুসম্পূর্ণ ও সুবিচারিত প্রবন্ধ ইতিপূর্বে কোনো বাঙলা পত্রিকায় আমি দেখিনি''।

এইভাবে, আধুনিক কবিদের স্নেহের চোখে দেখলেও অথবা তাদের সাহিত্যবোধে আস্থা প্রকাশ করলেও 'আধুনিক কবিতা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল। সেই সংশয় তিনি বারেবারেই ব্যক্ত করেছেন কবিদের কাছে লিখিত তাঁর চিঠিপত্রে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন, ''নতুন যারা লিখছেন আর আমার মতো সেকেলে লিখিয়ে, আমরা অসমান ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি''। ''আমাদের রসসম্ভোগের অভ্যাস তোমাদের ও যুগের নয়''— আধুনিক কবিদের উদ্দেশ্যে এবং আধুনিক কবিতার প্রতি এই ছিল রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত বক্তব্য।

'রসসম্ভোগের অভ্যাস' -এর এই যে ভিন্নতার কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ, এ ভিন্নতারও কিন্তু একটা ধারাবাহিকতা আছে। সময়ে সময়ে সেটা পাল্টায়, অনিবার্যতই। এ প্রসঙ্গে মনে করতে পারি একটি আলোচনাসভার কথা, যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে। এই সভার বিবরণ দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'সামান্য অসামান্য' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৬) প্যাপিরাস) নামের বইতে 'কৃত্তিবাসের যুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধে বিশিষ্ট অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তকে উদ্ধৃত করেছেন লেখক—

''সাহিত্যের ইতিহাসে একটা কৌতুক আছে। আমরা এখানে শুনলাম যে বুদ্ধদেব বসু এখন অভিযোগ করছেন এই দুর্বোধ্যতা আর অশ্লীলতা নিয়ে। অভিযুক্ত পক্ষ তাঁরই জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত আর তার বন্ধুবান্ধবেরা। বছর তিরিশেক আগে (ঠিক ঠিক বলতে গেলে পঁয়ত্রিশ বছর। এই বুদ্ধদেব বসু আর তাঁর সঙ্গীসাথীরাই ছিলেন অভিযুক্ত, অভিযোগকারী সেদিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর অভিযোগটাও ছিল একই, সেই দুর্বোধ্যতা আর অশ্লীলতার অপরাধী। তারও অনেক বছর আগে এই একই অভিযোগ তো করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরও বিরুদ্ধে। তরুণ রবীন্দ্রনাথই তখন অভিযুক্ত, আর অভিযোগকারী ছিলেন সে-যুগের প্রবীণেরা। প্রতিযুগেই এ-রকম ঘটতে থাকে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। একযুগের অভিযুক্তরা অন্যযুগের অভিযোগকারী

হয়ে ওঠেন। হয়তো দেখা যাবে, আজকের দিনের এই তরুণেরাও বয়স হবার পর ভবিষ্যতের তরুণদের আক্রমণ করবেন প্রায় একই কারণে, একই ভাষায়।" (পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫)

কেবল 'দুর্বোধ্যতা আর অশ্লীলতা'-ই নয়, পরবর্তী প্রজন্মের কবিতা সম্পর্কে অন্যরকম আপত্তিও ছিল বুদ্ধদেব বসুর। তাঁর উল্লেখ পাই শঙ্খ ঘোষেরই আর একটি লেখায়। ''ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ' (জানুয়ারি ২০০৭, আজকাল) বইয়ের 'করুণ রঙিন পথ' নামের প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনে আয়োজিত এক সাহিত্যমেলায় বিবরণ শোনান তিনি, সময়টা ১৯৫২-৫৩ সালের কাছাকাছি। সেখানে স্বাধীনতার পরবর্তী পাঁচ বছরের কবিতা বিষয়ক আলোচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র - পরবর্তী কবিদের লেখাপত্র নিয়ে কথা বলছিলেন। ''কবিতায় যে সাধারণ মানুষের জীবন চাই, জনসমুদ্রকে এড়িয়ে গিয়ে নির্জন গুহার কাব্যবিলাসে যে আর রুচি নেই কারো, বেশ ঘোষণা করেই সেকথা জানান তিনি। নাম করেই তিনি বলেন বিষ্ণু দে-র কথা, জনতার দিকে মুখ ফেরানো তাঁর কবিতার কথা। নাম করেই তিনি প্রত্যাখ্যান জানান জীবনানন্দকে, অমিয় চক্রবর্তীকে। সময়ের কণ্ঠরোধ করে কথা বলছেন এঁরা, মনে হয় তাঁর। তুলনায় তরুণতম কবিরাও যে লৌকিক ছড়ার স্পর্শ দিয়ে তুলে আনছেন লোকজীবনের জটিল আবেগকেও, একেবারে সাম্প্রতিক কোনো কোনো লেখা থেকে তুলে ধরছেন তার উদাহরণ।" (পৃষ্ঠা ১০৬)

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সাধারণ মানুষের খবর তেমন নেই, এমন একটা অভিযোগ ছিল বুদ্ধদেবের। সেই অভিযোগই, তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আর, উল্টোদিকে, বুদ্ধদেব বসু আপত্তি তুললেন পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের কবিতার বিষয় নিয়ে। এখন কিন্তু তাঁর মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথেরই সাবধানবাণী। ''ফুল্লরার সেই আমানি খাবার কান্না দিয়েই যে কবিতা লেখা শুরু হয়েছে আবার, এ খুব সুলক্ষণ নয়।"

শুধু ভিন্ন প্রজন্মের কবিদের ক্ষেত্রেই যে মতের অমিল স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তা তো নয়— একজন কবি বিভিন্ন সময়ে লেখা কবিতার ক্ষেত্রেও বিশেষ (নির্দিষ্ট) একজন কবিতাপাঠের রুচির তফাৎ অনেকসময় ঘটে যায়। জীবনানন্দ দাশ নিজেই, তাঁর কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর অভিমতের বিভিন্ন সময়ে যে পার্থক্য ঘটেছে, তা লক্ষ করেছেন। ''আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে—'বনলতা সেন -এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি'— লিখেছিলেন জীবনানন্দ। (জনৈক অনুরাগীকে লেখা চিঠি ৩, 'বিভাব' জীববনান্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৪৪০)। ঐ একই চিঠিতে দেখি, তখনই অনেকটা অন্যরকম ভাবছিলেন আর একজন আধুনিক কবিতা তথা সম্পাদক— ''নিরুক্ত' ও 'পূর্ব্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার শেষের দিকের কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক - চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে।" (পৃষ্ঠা ৪৪০)

তাই, রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সময়কার নবীন আধুনিক কবিদের তর্কবিতর্কের পর এতদিন পেরিয়ে এসে 'আধুনিক কবিতা' সম্পর্কে অনেক সংশয় যেমন কেটে গেছে, তেমনই রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে কোনো ছদ্ম - বিদ্রোহেরও নতুন করে আজ আর প্রয়োজন নেই। বরং, এ যুগের ভাবনায় রবীন্দ্ররচনা নতুনভাবে জারিত হয়ে নানাভাবে বিশ্লেষণের পথ খুঁজছে। ''তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয় পাপোষে' — লিখেছিলেন যে তরুণ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আজ প্রবীণ বয়সে, রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সংকলন করে তিনিই রবীন্দ্র কবিতার এক নির্বাচিত সংকলন পাঠকদের হাতে তুলে দিতে চান। রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাই আর পাঠযোগ্যতা দাবি করে না, কিন্তু তাঁর অনেক কবিতাই চিরকালীন— এমনটাই মনে করেন তিনি। নির্বাচন নিয়ে মতান্তর নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময়ের অনেক দূরে দাঁড়িয়ে এ খানিকটা মোহবর্জিত বিচার তো বটে। জয় গোস্বামীর গদ্যপদ্যে রবীন্দ্র - অনুষঙ্গের বহুলতা আমরা তো সহজেই লক্ষ করি। রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষ কোনো অংশ বা পঙক্তিকে নিজের কাব্যচর্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝিবা তিনি প্রকাশ করতে চান, অনেক সময়। এমনকি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, পারিবারিক বা সংসারী রবীন্দ্রনাথ— এই সময়ের কবিদের কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণা বসু, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সুবোধ সরকার, বীথি চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক কবিতার মেজাজ নিয়ে এসেছিলেন, সেই কবীর সুমন তাঁর একটি গানে রবীন্দ্রনাথের 'এসো নীপবনে, ছায়াবীথিতলে / এসো করো স্নান নবধারাজলে'—গানটি সাম্প্রতিকের প্রেক্ষিতে নতুনভাবে পড়েছেন। আবার, গানের দল 'চন্দ্রবিন্দু'র কোনো গানের কোনো চরিত্র যদি কখনো বলে 'আমায় বাঁচাও রবিঠাকুর/ আমি নোংরা এক আস্তাকুঁড়'— তখন, সম্পূর্ণ পৃথক একটি অবস্থানে দাঁড়িয়ে সে হয়তো রবীন্দ্রনাথের কাছে মননের আশ্রয় প্রার্থনা করে।

এভাবেই, ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, সকলের ভাবনায় নিয়ত খেলা করে চলেছেন অবধারিতই, এই সময়ে— বর্তমানে

গ্রন্থঋণ

১। 'বিভাব' জীবনানন্দ জন্মশতর্ষ সংখ্যা ১৯৯৮

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চিঠিপত্র - ষোড়শ খণ্ড - সুতপা ভট্টাচার্য সম্পাদিত বিশ্বভারতী ১৯৯৫

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চিঠিপত্র - ঊনবিংশ খণ্ড - শ্রীমতি সাগর মিত্র সংকলিত ও সম্পাদিত - বিশ্বভারতী ২০০৪

৪। শঙ্খ ঘোষ - সামান্য অসামান্য - প্যাপিরাস ২০০৬

৫। শঙ্খ ঘোষ - ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ - আজকাল ২০০৭